ষষ্ঠ অধ্যায়

শঙ্খ ঘোষের কবিতা : চিত্রকল্প ও ছন্দ

শঙ্খ ঘোষের কবিতা পুনরাবৃত্তিহীন সত্য-আলোর কবিতা— যে আলো-স্নানে সমস্ত আবিলতা-বিভ্রম-ব্যর্থতা-গ্লানি-শঠতা-মিথ্যাচার-অপমান-হীনম্মন্যতা-প্রাণহীনতা-বোধহীনতা-অবমূল্যায়নরাশি উজ্জ্বলতম সরল প্রাণময়-সত্য হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতায় মন-মনন-বোধ জ্ঞান-জীবন-সত্যি সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চিত্রকল্পের অনুরণন এবং ছন্দের প্রাণ-প্রবাহ গাঢ়তর দ্যোতনাময়। চিত্রকল্প ও ছন্দ— কবিতার এই দুই বর্ণময় মণ্ডনকলা পরপর আলোচিত হল।

> ''কবিতার প্রতিমা এই গাঢ়তর অর্থদ্যোতনার দিকে টান দিতে চায় আর তারই সঙ্গে রচনাকে করে তোলে ঘনতাময়। ইংরেজি-মার্কিন কবিতায় এজরা পাউণ্ডের ইমেজিজম আন্দোলনের মূলে ছিল কবিতা-শরীরের সেই সংহতির ভাবনা। একটি প্রতিমাকে ঘিরেই একটি কবিতা কেমন পূর্ণ এবং স্বস্থ হয়ে উঠতে পারে, এর পরীক্ষা ছিল তাঁদের।...
>
> কবিতার প্রতিমা আজ তাই কবির কাছে উপকরণ মাত্র নয়। এক হিসেবে এটা তাঁর যুদ্ধেরও চিহ্ন। অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে লগ্ন হবার, অথবা জীবনের প্রত্যক্ষ সংঘাতে নিজের বোধকে চিনে নেবার দায়িত্ব কবির : কবি আর জীবনের মধ্যে এই সংঘর্ষের সম্পর্ককে ধরিয়ে দেয় প্রতিমা। তাই এর প্রয়োগে এসে যায় সমকালীনতা, স্থানকালে বিশেষিত অভিজ্ঞতার চাপ তৈরি হয় কবিতার শরীরে। আবার এরই সঙ্গে চলতে থাকে অত্মগঠনেরও প্রক্রিয়া, ব্যক্তি ও বিশ্বের পারস্পরিক সম্পর্কে জাত আত্মচরিত্র। তাই এই প্রতিমা হয়ে ওঠে একইসঙ্গে কবির বিষয় ও উপায়।''[১]

—'তাই এই প্রতিমা হয়ে ওঠে একই সঙ্গে কবির বিষয় ও উপায়'। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় 'প্রতিমা' কীভাবে 'যুদ্ধের চিহ্ন', 'জীবনের সঙ্গে লগ্ন' এবং 'সংঘর্ষ'— 'সমকালীন, স্থানকালে বিশেষিত অভিজ্ঞতা', 'আত্মগঠন'— 'ব্যক্তি ও বিশ্বের পারস্পরিক সম্পর্কে জাত আত্মচরিত্র' হয়ে উঠল তা আলোচনার পূর্বে 'প্রতিমা' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত— ইংরেজি 'Image' শব্দটির পরিভাষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহার 'প্রতিমা' রূপে, আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভাষায় 'চিত্রকল্প', বিষ্ণু দে-এর মতে 'কল্পপ্রতিমা', অমলেন্দু বসুর প্রতিশব্দে 'বাক্‌প্রতিমা'। আলোচনার সুবিধার্তে 'চিত্রকল্প'-এর ভেতরে অন্যান্য পরিভাষাসমূহ ধরা থাকল।

স্বাভাবিকভাবে এদেশের কবিতায় 'লক্ষণযুক্ত উপমায় চিত্রকল্পের সম্ভাবনা ছিল' কিন্তু কালিদাসের উত্তর সাধকদের হাতে সেই সম্ভাবনা বিস্তার লাভ করেনি। অতএব, গন্তব্যস্থল 'ফরাসী প্রতীকী কবিদের দরবার' এবং ইংরেজি মার্কিন কবিতা—

"প্রতীকী কবিরাই প্রথম কবিতায় বাচ্যার্থ পরিহার করে চেতনার অবাচ্য অনুভূতিগুলিকে অবয়ব দিতে চিত্রের চিত্রকল্পের উৎসমুখ অবারিত করে দিলেন। প্রতীকী কবি গুস্তাভ খান চিত্রকল্পের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে এলেন নূতন এক কাব্য-আন্দোলনের নায়কবৃন্দ— টি.ই. হালমে, এফ.এস. ফ্লিন্ট, লাফর্গের অনুসরণ করে এলেন মার্কিনী কবি টি.এস. এলিয়ট ও এজরা পাউণ্ড। কবিতা থেকে কৃত্রিম আবর্জনাজ্ঞানে এঁরা ছন্দ, মিল এমনকি চিরাচরিত অলংকারগুলিও বাদ দিতে চাইলেন। ভিক্টোরিয়া যুগের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুও বাতিল হলো। আর কবিতার বরাদ্দ হয়ে হয়ে এলো নূতন ঐশ্চর্য চিত্রকল্প। আন্দোলনের নামই হলো ইমেজিসম্। চিত্রকল্পবাদ।

১৯১০ সালে প্রকাশিত হলো টি.এস. এলিয়টের 'Portrait of a lady' — প্রথম সার্থক চিত্রকল্পবাদী কবিতা। নূতন ধরনের চিত্রকল্প দেখা গেল এইসব কবিতার মধ্যে। ব্যঙ্গদিগ্ধ এক অভিজাত রচনারীতি নূতন যুগের সূচনা করলো। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হলো প্রথম কবিতা সংকলন 'Some Imagist poets'। তার ভূমিকায় ঘোষিত হলো : 'বাক্ সংহতিই কবিতার প্রাণরস।"[২]

'Image' বা 'চিত্রকল্প' শঙ্খ ঘোষের কবিতায় কীভাবে নির্মিত সেই আলোচনায় আসার আগে স্মরণীয় Ezra Pound কথিত 'Image' কথা—

"An 'Image' is that which present an intellectual and emotional complex in an instant of time... It is the presentation of such a complex instantaneously which gives that sense of sudden liberation, that sense of freedom from time limits and space limits, that sense of sudden growth which we experience in the presence of greatest works of Art.

It is better of present one Image in a lifetime than to produce voluminous works."[৩]

চিত্রকল্পর কবিতার সেই মায়দর্পণ— যাতে কবিচিত্তের ভাব আবেগ মেধার মিথষ্ক্রিয়ায় তৃতীয়মাত্রা যোগ হয় এবং উদ্ভাসিত করে।

"What do we understand, then, by the poetic image? In its simplest terms, it is a picture made out of words. An epithet, a metaphor, a simile may create an image; or an image may be presented to us in a phrase or passage on the face of it purely descriptive, but conveying to our imagination something more than the accurate reflection of

an external reality. Every poetic image, therefore, is to some degree metaphorical. It looks out from a mirror in which life perceives not so much its face as some truth about its face. This, I know, is a controversial statement. So let us go back for a moment to the definition of an image as a picture made out of words. The commonest type of image is a visual one; and many more images, which may seem un-sensuous, have still in fact some faint visual association adhering to them. But obviously an image may derive from and appeal to other senses than that of sight."[৪]

জ্যোতি ভট্টাচার্য চিত্রকল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এভাবে—

"কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা যে কল্পনাশ্রয়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সূচিত হয়ে রূপবর্ণশব্দ-গন্ধস্পর্শ ও স্বাদ প্রভৃতি নানা সংবেদনের একটির বা একাধিকের স্মৃতি বহন করে এবং উদ্‌বোধ জাগায় সেই বস্তু চিত্রকল্প। চিত্রকল্পে চিত্রের আভাস থাকে। চিত্র সাধারণত দৃষ্টি গ্রাহ্য। কিন্তু এই সংজ্ঞায় 'চিত্র' শব্দটির অর্থ ব্যাপক— চিত্রকল্প দৃষ্টি গ্রাহ্য তো হতেই পারে, তা ছাড়া শ্রবণগ্রাহ্য, স্পর্শগ্রাহ্য, ঘ্রাণগ্রাহ্য সবই হতে পারে, এবং যেসব সংবদেন আপন শরীরের অভ্যন্তরে প্রখর অস্মিতা বোধ জাগায়, সে রকম সংবেদনও চিত্রকল্পের বস্তু হতে পারে।"[৫]

আবার অমলেন্দু বসুর ভাষায়—

"সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা আর ভাষার চূড়ান্ত ব্যষ্টিরূপ শব্দে। প্রত্যেক শব্দেরই দুটি ক'রে অর্থ-দ্যোতনা সম্ভব: একটি তার সামান্যার্থ যা বিনা ব্যাখ্যায় বিনা দ্বিধায় সবার কাছেই স্পষ্ট, যার আভিধানিক ও সাহিত্যিক প্রয়োগ অভিন্ন; আরেকটি তার বিশেষ অর্থ, সাহিত্যিক প্রয়োগের অনন্য পরিবেশে যে অর্থের সূচনা পাওয়া যায়। সাহিত্যিক প্রয়োগে বিশেষ অর্থের সুযোগ আছে, সাধারণ ব্যবহারিক প্রয়োগে নেই, তবুও সাহিত্যিক প্রয়োগে শব্দমণ্ডলীর অধিকাংশে যদি আভিধানিক সামান্যার্থ বর্তমান না থাকে, অধিকাংশ শব্দই যদি সাহিত্যিকের কল্পনার চাপে সামান্যার্থ ছাড়িয়ে যেতে থাকে, তা'হলে সমগ্র সাহিত্যকর্মটি মেরুদণ্ড-হীন হ'য়ে পড়ে, কেননা ভাষার তথ্যজ্ঞাপনশক্তিতে ও যুক্তিশৃঙ্খলেই যে কোনো ভাষা-প্রয়োগের মেরুদণ্ড। যে সৃজনী-চেতনা কবি থেকে পাঠকে সঞ্চারিত হচ্ছে তার স্রোতোপথ ভাষায়, সে স্রোত অবাধে চলতে হ'লে পাঠক যে ভাষার সঙ্গে পরিচিত সে ভাষাতেই কবিকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে, সম্পূর্ণত না হোক প্রধানত। অপর

পক্ষে, কবি যদি শুধু সামান্যার্থেই নিযুক্ত থাকেন, তাঁর শব্দপ্রয়োগ যদি আচমকা নূতন ইঙ্গিত, নূতন দ্যোতনা দিতে না পারে, তাহ'লে শিল্পরসে অভাব থেকে যায়। শব্দের যে আভিধানিক অর্থে আমরা অভ্যস্ত, সহসা যখন সে-অর্থের পাশ কাটিয়ে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো শব্দটি অপ্রত্যাশিত দ্যুতিলাভ করে তখন পাঠকচিত্তে যে-বিস্ময়ের সঞ্চার হয় সে-বিস্ময় শিল্পসুখের অঙ্গ।''[৬]

অর্থাৎ কাব্যের ভাষা অনিবার্য রকমে ব্যঞ্জনাধর্মী। সৎ কবির প্রয়োগে কথাগুলি তাদের ব্যবহারজীর্ণ আভিধানিক অর্থের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল ও গভীর দ্যোতনায় সমৃদ্ধ হয়, আর অর্থের সংবেদনশীল পাঠক মাত্রেই জানেন যে সার্থক কাব্যের ভাষার এই ব্যঞ্জনাশক্তি সচরাচর কোনো না কোনো ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতার রূপ গ্রহণ করে। কবির আবেগ ও চিন্তা সমূর্ত হয় ধ্বনি-স্পর্শ-ঘ্রাণ-দৃশ্যে আবেদনে, অর্থাৎ যে ধ্বনিরূপ, দৃশ্যরূপ, ঘ্রাণরূপ ও স্পর্শরূপ ব্যঞ্জিত হয়েছে বাক্যের সমাবেশে তারই মধ্য দিয়ে কবির আবেগ ও চিন্তার সন্নিহিত হতে পারেন পাঠক। এই উপমা, রূপক, প্রভৃতি পোয়েটিক ইমেজই বাক্‌প্রতিমা।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বর্তমান অস্থির যুগসংকটকথার সঙ্গে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে বিপুল ভালোবাসা-বিশ্বাসের মিলনভূমি দেখা যায়। বহুরৈখিক ঘটনার বহুতলিক প্রকাশে আত্মসাক্ষাৎ অনিবার্য স্পন্দনে স্পন্দিত হয়। কিছু ব্যঙ্গ, কিছু অসহায়তা— সত্তার আকুতি নিয়ে সমগ্র হয়ে ওঠে। মূলত মন্ময় কবিতা অর্থাৎ উচ্চারণ ব্যক্তিগত অথচ পরতে-পরতে সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রগাঢ় ছায়া। তিনি শব্দের সীমা ভেঙে অতলে ডুব দেন আবার নিঃশব্দের সীমা শব্দ দিয়েই স্পর্শ করেন— তাতে আড়াআড়িভাবে অঙ্কিত হয় নিশীথনগরের সকল অভিজ্ঞতা। তাঁর কবিতার বিষয়— জীবনচিত্র, আর উপায়— চিত্রকল্প। তাতে অনায়াসে ইতিহাসকে ধারণ করে 'তুমি' 'আমি' 'আমাদের' সমাজ দেশ-কালের কথা অলংকরণ এবং অলংকরণহীন ভাবে উঠে এসেছে।

''জল কি তোমার কোনো ব্যাথা বোঝে? তবে কেন, তবে কেন
জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে?
জল কি তোমার বুকে ব্যাথা দেয়? তবে কেন তবে কেন
কেন ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার?''[৭]

—যে 'জল' কোন ব্যথা বোঝে না সেই 'জলে' 'নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে' যাওয়া যায়? আবার যে 'জল' বুকে ব্যথা দেয় না সেই 'দিনের রাতের জলভার' ছেড়ে যাওয়া সম্ভব? প্রকৃতপ্রস্তাবে, শঙ্খ ঘোষ নিবিড় ভালোবাসার কবি— আত্ম, সমাজ দেশ কাল অঙ্কনের। বস্তুত, ভালোবাসা এবং প্রশ্ন— আত্মজিজ্ঞাসা সরাসরি না বুঝিয়ে অথবা নিছক ক্রিয়া বিশেষণ উপমা দিয়ে বোঝানোর নিস্ফল প্রয়াস না চালিয়ে তাঁর ভালোবাসার অসহায়তা এবং অপরাজেয় ভালোবাসা জল-জীবনের

চিত্রকল্পে অনন্যরূপে উদ্‌ভাসিত।

''ঘর, বাড়ি, আঙিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে—

ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!''[৮]

'শব্দের প্রকৃতবোধ' লুপ্তাঞ্চলে শঙ্খ ঘোষের কবিতা 'শব্দের প্রকৃত বোধের' কবিতা— যা কুয়াশাপথ অতিক্রম করে আলোস্থানে উত্তীর্ণ করে দেয়। 'মিথ্যাচারী, মিথ্যাভাষী, শঠ, আমিই মহান, দেখ্ আমাকে'— নয়, 'মন্থর পুনরাবৃত্তি' বা 'অবাধ প্রগল্‌ভতা' নেই, কেবল আছে 'সত্যি'— 'সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার।' এই মর্মরস্থানে 'ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!'— জানার কথাও নয়, কেবল অনুভব করার কথা। 'ঘর, বাড়ি, আঙিনা/সমস্ত সন্তর্পনে ছেড়ে দিয়ে মামিমা/ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে— '! 'সন্তর্পণে'! 'সাঁকো পেরিয়ে'! এই বহুতলের মায়া কবিতাটির পাশাপাশি রাখা যেতে পারে 'মুনিয়া' নামক কবিতাটি—

''মুনিয়া সমস্ত দিন বাঁধা ছিল।

খুব বারোটায় উঠে চুপি চুপি খাঁচা খুলে

'উড়ে যা' 'উড়ে যা' বলে প্ররোচনা দিতে
আমার বুকের দিকে তুলে দিল ঠ্যাঙ—

জ্যোৎস্নায় মনে হলো বাঘিনীর থাবা।''[৯]

কবিতা দুটি বিষয়ে একজন সমালোচক বলেছেন—

''শঙ্খ ঘোষের 'মুনিয়া' ও 'রাঙামামিমার গৃহত্যাগ' ইমেজিস্ট কবিতা। কারণ কবিতাদুটিতে কবি যা বলতে চেয়েছেন তা সরাসরি না-বলে দুটি ছবি এঁকে দিয়েছেন এবং শেষপর্যন্ত ওই ছবিদুটিই পাঠকের মনে জেগে থাকে। একটি হল ছড়িয়ে-থাকা পালকের ছবি এবং অন্যটি হল জ্যোৎস্নায় বাঘিনির উদ্যত থাবার ছবি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে কেন আমি আগে বলেছিলাম যে শঙ্খ ঘোষের এই কবিতাদুটি পাশাপাশি রেখে অথবা পরপর পড়া উচিত। রাঙামামিমা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন অনেক-অনেক দূরে কোথায় গেছেন তিনি কেউ জানে না। তিনি নেই, কিন্তু এমন অনেক চিহ্ন রয়ে গেছে যা দেখে বোঝা যায় তিনি একদিন

এই বাড়িতে ছিলেন। কবি এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন, কিন্তু সরাসরি না-বলে পাঠককে একটি ছবি উপহার দিলেন : 'ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!' যে-মুনিয়াকে সমস্ত দিন বেঁধে রাখা হল, তাকে রাত্তির বারোটায় খাঁচা খুড়ে উড়িয়ে দিতে চাওয়া এক মর্মান্তিক পরিহাস। অত রাতে সে কোথায় যবে। কীভাবে সে পথ খুঁজে পাবে। তাই, যে খাঁচা খুলে দিয়ে তাকে উড়ে যাওয়ার প্ররোচনা দেয়, তার বুকের দিকে সে ঠ্যাঙ তুলে দেয়। কিন্তু মুনিয়ার ঠ্যাঙ তো বিরাট কিছু নয়। মুনিয়া তো ছোট্ট-একটি পাখি। কিন্তু এই ঠ্যাঙ তুলে ধরার মধ্যে যে-ঘৃণা রয়েছে তা কিন্তু ছোট নয়। কবি সে-কথাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তা সরাসরি না-বলে পাঠককে উপহার দিলেন একটি ছবি এবং শেষপর্যন্ত অন্যসব ছবি মুছে গিয়ে ওই ছবিটিই পাঠকের মনে চিরদিনের জন্য জেগে থাকে; 'জ্যোৎস্নায় মনে হল বাঘিনীর থাবা।' পাউণ্ড একেই বলেছেন 'One idea set on top of another.'।''[১০]

তাঁর 'আধখানা মুখ' সবসময়েই বাইরে আর 'আধখানা মুখ' ভেতরে— একই শব্দ অথচ প্রত্যেকবারেই আলাদা অর্থে প্রযুক্ত! প্রসঙ্গত বলা ভাল, চিত্রকল্প মূলত এমনই— যা চেতনাকে জাগিয়ে তোলে এবং অনুভূতির শিকড়স্থানে কড়া নাড়ে।

''ঈশানে নৈর্ঋতে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে
মাটির উপর মুখ রেখে
সে এখন শুয়ে আছে শেষ রাতের খোলা প্রান্তরে

আর কেউ নেই
শুধু তার পিঠের দিকে তাকিয়ে অছে লক্ষ লক্ষ তারা

হাতের ডানায় লেগে আছে ঘাসের সবুজ, বুকে ভেজা মাটি
এইটুকু ছাড়া
যেন কোনো কোমলতা ছিল না কোথাও কোনোখানে

তারপর
আকাশ আর পৃথিবীর ঢাকনা খুলে বেরিয়ে আসে ভোর
এসে দেখে :

যেখানে সে পা দুখানি রেখেছে, সেখানে

কাল বিকেলের শেষ ঝড়ে
পড়ে আছে কুরে-খাওয়া সনাতন মহানিমগাছ।।''[১১]

শঙ্খ ঘোষের কবিতার শব্দ বিন্যাসের নিপুণতা এবং ধ্বনিগৌরবের মিশ্রিত মাধুর্য চিত্রকল্পের পরিধিকে আরও বেশি বিস্তৃত ও নিগূঢ় করে তুলেছে। তাঁর কবিতার চিত্রকল্পে একই সঙ্গে আসক্তি ও নিরাসক্তি, লিপ্ত ও নির্লিপ্ততা এবং বিষাদের সঙ্গে সুন্দর জড়ানো আছে।

> ''কবিতার ইমেজে চিত্রকল্পে প্রতিমাতেও একইভাবে সয়ের দেশকে সময়াতীত দেশে পৌঁছে দেবার দায়ে এসে যায় আসক্তি-নিরাসক্তির যুগলতা। বাক্‌প্রতিমায় ধরা পড়ে সময়, জীবনের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্পর্ক, আবার তার থেকে উত্তরণ। আসক্তি সরে যায় কবিতার প্রতিমায়।... কবিতার প্রতিমা ব্যবহারে তাঁর আসক্তি সরে যায় তার নিরাসক্তির দিকে। 'লিপ্ত হয়ে থাকার মধ্যেই এই নির্লিপ্ততা থেকে যায় বলে সুন্দরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিষাদ।''[১২]

তাঁর কবিতা জীবনের সঙ্গে মগ্ন হবার কবিতা— তাতে সমকালীন স্থানকালের বিশেষিত অভিজ্ঞতা নিহিত। একদিকে ভাঙনের শব্দ অন্যদিকে গড়তে চাওয়ার আর্তনাদ— মাঝে 'জয়ধ্বনি তোলে নিশান আমার নিশান তোমার নিশান' অথবা 'সবাইকে পথ দেবার জন্যে কয়েকজনকে সরতে হবে'! তবে এই সাম্প্রতিকতাই ইতিকথা নয়, ক্ষণকালকে নিয়ে বাঁধেন কালাতীত 'ত্রিতালে'। সমাজ দেশ কাল, রাজনীতি ক্ষণভঙ্গুর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মুখোশের ভেতর থেকেই দেখেন গভীরতম মুখশ্রীকে— বিষয় থেকে ব্যক্তিতে এসে আবিষ্কার করেন নিজেকে, দায়যুক্ত ভালোবাসার অধিকারী নিজেকে।

> ''ঘর যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়
> সমস্ত মিলায়
> এমন মুহূর্ত আসে যেন তুমি একা
> দাঁড়িয়েছ মূহূর্তের টিলার উপরে, আর জল
> সব ধারে ধাবমান জল
> প্লাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পথহীন প্রিয়হীন পরিচিতহীন
> আর, তুমি একা
> এত ছোটো দুটি হাত স্তব্ধ করে ধরেছ করোটি
> মহাসময়ের শূন্যতলে—
>
> জানো না কখন দেবে কাকে দেবে কতদূরে দেবে?''[১৩]

—ব্যক্তিসংকটের নির্মম হৃদয়ভেদ্য সংকটের ছবি অন্তহীন অর্থের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত— ব্যক্তিসত্তা,

নৈঃশব্দ্য, গোপন ও গহন অন্তরালকে ইতিহাসের চৈতন্যে গেঁথে নেন শব্দের নতুন অর্থে।

''ঘনতার এই আয়োজনে অনেকসময়ে ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে আধুনিক কবির প্রতিমা, অনেকসময়ে দুই প্রতিমার সংযোগকে লুপ্ত রেখে যান আধুনিক কবি, অনেকসময়ে তিনি নির্ভর করেন কোনো গূঢ় অবচেতনের ওপর, আর এইভাবে মনে হয় যেন কোনো অচেনা পৃথিবীতে এসে পৌঁছলাম আমরা। কিন্তু সেই প্রয়োজনে কেবল যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রজগৎ বা প্রাত্যহিক রূঢ়জগৎকেই তিনি ব্যবহার করেন তা নয়, তাঁর সেই বোধে সঞ্চলিত হতে পারে এই বিশ্বচরাচরের সবই, মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত ছড়ানো তাঁর যে কোনো অভিজ্ঞতাই।''[১৪]

শঙ্খ ঘোষ শব্দ-তরঙ্গের মধ্যেকার নৈঃশ্যব্দকে ধরার অধিকারী— আলো-তরঙ্গের মধ্যেকার নিরন্ধ্র অন্ধকারকে। তাঁর কবিতা—

''প্রত্যুষের পাখিকুজন ঘুমভাঙানোর বার্তা আনবে জেনে
শয্যাপিষ্ট যে নিরাসক্ত মন
ইতিহাসের কুঠারে ঈশ্বরের টুকরো-টুকরো-খণ্ড অভিশাপ
বর্ষণ করে তার মাথায়,
মৃত্যুর শোচনীয় গহ্বরে মুহূর্তে তলিয়ে যায় তারা;
এবং আর এক মহান মৃত্যু দুর্গম নিশ্চিতের লালপথে
আহ্বান জানায় সকলকে।
মেঘ থেকে ছিন্ন বৃষ্টিতে আমরা সিক্ত
এবং আমাদের ডেরায় পানীয়ের সন্ধান নেই কোনো
মৃত্যু যদিও তোমায় স্তূপ স্তূপ জমায়
বৃষ্টি তাকে বন্যা করে কঠিন ছল ভাঙছে।''[১৫]

'বৃষ্টি তাকে বন্যা করে কঠিন ছল ভাঙছে'— তুমি-আমি আমরা-ইতিহাস-সমাজ-সময়-জীবনের গভীরতম সমস্যা-সংকট, মুখশ্রী এবং মায়াময় ভালোবাসা অঙ্কিত।

''অপরূপ অন্ধ রাত, তোমারও কি জলকষ্ট আছে?
এসো তবে দুমিনিট বসি
এসো তবে আমরা দুজনে মিলে বহুযুগযুগান্তর ধরে
জলের গোপন দুঃখ বলে যাই পৃথিবীর কানে।

গানগুলি শোনাই হলো না
ব্রতধারণের কথা—তাও গেছি ভুলে;

আমার দিনের সঙ্গে মিশে যাক তোমার সীমানা
তোমার নুড়ির মধ্যে আমার জলের অধিকার।''[১৬]

—মূলত খণ্ড-বিখণ্ড স্মৃতি, আবেগ, বর্তমানে বেঁচে থাকা— ক্ষয়, অপমান, আত্মঅহংকার— নানা প্রসঙ্গ কবির অভিজ্ঞতায় নির্বিশেষে আভাসিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প কেবলমাত্র চিত্রের সমাহার নয়, আক্ষেপ-অপূর্ণতার কথা; বর্তমান সময়ের বোধ— দেশ-কাল সম্পৃক্ত ছবি—

''অনেকদিন মেঘের সঙ্গে কথা বলোনি তাই এত শুকনো হয়ে আছো। এসো তোমার মুখ
মুছিয়ে দিই

সকলেই শিল্প খোঁজে রূপ খোঁজে আমাদের শিল্পরূপে কাজ নেই আমরা এখানে বসে
দু-একটি মুহূর্তের শস্যফলনের কথা বলি

এখন কেমন আছো বহুদিন ছুঁয়ে তো দেখিনি শুধু জেনে গেছি ফাটলে ফাটলে নীল
ভগ্নাবশেষ জমে আছে

দেখো এই বীজগুলি অধম ভিখারি তারা জল যায় বৃষ্টি চায় ওতপ্রোত অন্ধকারও
চায়

তুমিও চেয়েছ ট্রামে ফিরে আসবার আগে এবার তাহলে কোনো দীর্ঘতম শেষকথা হোক
অবশ্য, কাকেই-বা বলে শেষ কথা! শুধু

দৃষ্টি পেলে সমস্ত শরীর গলে ঝরে যায় মাটির উপরে, আর ভিখারিরও কাতরতা
ফেটে যায় শস্যের দানায় এসো মেঘ ছুঁয়ে বসি আজ বহুদিন পর এই
হলুদডোবানো সন্ধ্যাবেলা।''[১৭]

বিষয়ের নিবিড়তা, অস্পষ্টতা, কবিতাটির বিভিন্ন স্তবক ও পঙ্‌ক্তি, অনুষঙ্গ ও ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে যে আবেগের প্রকাশ— তাতে সব মিলিয়ে সামগ্রিকবোধের রহস্য লুকিয়ে আছে পরতে-পরতে। শঙ্খ ঘোষের কবিতার সেই না-ছোড় মানুষ-জীবনকথা উপস্থিত। সামাজিক সত্য-সৌন্দর্যের মায়াময় চিত্র উপস্থাপিত। জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক— মুহূর্তের শস্যফলনের ভাষ্য, না-জানা নীল ভগ্নাবশেষ— 'দৃষ্টি পেলে সমস্ত শরীর গলে ঝরে যায় মাটির উপরে, আর ভিখারির কাতরতা ফেটে যায় শস্যের দানায় এসো মেঘ ছুঁয়ে বসি আজ বহুদিন পর এই হলুদডোবানো সন্ধ্যাবেলা।' কবিকে স্পষ্ট করে তোলে, কবিতাকেও। অনুধাবন সম্ভাব্য হয়ে ওঠে, কবির কবিতা কী বলতে

চায়? প্রতিদিনের বাচালতার পরিবর্তে যিনি নীরবে বুনতে পারেন মানুষের সত্তার সমস্যা—

''এবং আমার সামনে অন্য কোনো বাধকতা নেই
পাহাড়ের মেঘ এসে সর্বস্ব ঘিরেছে প্রান্তপথে
নিকট বা দূর সবই অবনীন্দ্রনাথের জলরঙ্গে
ভেসে আছে একাকার— তখন তোমার কথা ভাবি।
ভাবি যে না-থাকা দিয়ে কতখানি ঘিরে রাখা যায়
বিশ্বাসহীনের কাছে সেকথা ভোলাও লহমায়
ঘুরে ঘুরে যত আসি সেকথা ভোলাও লহমায়।
ঘুরে ঘুরে যত আসি পরিব্রাজকের ভিক্ষা নিয়ে
প্রতিটি তণ্ডুল তত মেঘের মণ্ডনে ভরে ওঠে—
সেই মেঘে জমে থাকে অকৃতার্থতার ব্যথাজল
এবং আমার হাতে তা-ই আজ অমোঘ সম্বল।''[১৮]

কবির কবিতায় মানুষ, মানুষের সত্তা এবং নিজেরও সত্তার সমস্যা বার-বার লিখিত। সত্তা— সাধারণত সমাজ দেশ কাল দ্বারা আবৃত। এই সমগ্রতার ছবি আততিময় চিত্রকল্পে অঙ্কিত।

''মানুষের সত্তার সমস্যা সেই শঙ্খ ঘোষের কতিায় ফিরে আসে। মানুষের এই সত্তা দেশ দিয়ে ঘেরা আর সেই দেশ কালে বিন্যস্ত। আত্ম থেকে পৃথক করে সমস্ত ভুবনকে তিনি দেখেন সমগ্রতায়— 'আমার আশ্লেষ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে নাও।' সেই দেখাই ছন্দে, বাক্‌প্রতিমায়, শব্দের আততিময় বুনোনে স্থায়িত্ব পায়। কবির অভিজ্ঞতাসূত্র ত্রিকালকে বেঁধে রাখে কবিতার একটি মুহূর্তে, মিলে যায় এইভাবে দৈনন্দিন আর চিরকাল— 'এক মুহূর্তের তাপে কেন্দ্র ও পরিধি কাছাকাছি'। 'দুয়ারহারা পথ'-এর কথা বারে-বারে মেলে শঙ্খ ঘোষের কবিতায়, সেই পথ পদ্মাতীর থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রসারিত। 'দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধুনুচির অন্ধকার', সেই দেশ শুদ্ধতার প্রতীক যেন। পঙ্কিল কলকাতায় বসেও লালন করেন 'বুক আড়ালে একশো গ্রাম'। গড়ে উঠেছে এক নষ্টভ্রষ্ট সভ্যতা, শিবলিঙ্গে বাদুড়ের ছায়া আজ, অন্নপূর্ণা জাগতে গিয়ে আমরা গড়েছি শ্মশানচারিণী। 'ভিখিরি ছেলের অভিমান' হাতে এনামেল বাটি, জাবাল সত্যকাম আত্মপরিচয়হীন। প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় এই বিবেকী কবির কবিতায়— 'গাব না আর গান এবার/ গাব না আর গান'। প্রতিবাদ ফেটে পড়ে 'বাংলা থেকে কিউবা থেকে ঘানা'। আত্মানুসন্ধানের সঙ্গে চলতেই থাকে তাঁর দেশানুসন্ধানের অভিযান। যখন 'কেউ কারো বন্ধু নয়, সকলে সবার আততায়ী', সকলেই আত্মজয়টিকা নিয়ে ব্যস্ত, তখন

রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার নিয়ে এই কবি আধোপ্রেত পর্যটকের মতো, প্রাচীন নাবিকের মতো দেশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন, 'খুঁজেছি তোমার হাত, সব বেচাকেনা ফেলে তোমাকে খুঁজেছি প্রতিদিনই'। সময়ের নির্যাস শিল্পে সংযত হয়ে মিত কথনে ফুটে ওঠে শঙ্খ ঘোষের কবিতায়।''[১৯]

—কবিতার চিত্রকল্পে ধরা পড়ে দেশ— দেশোত্তীর্ণ কথা অর্থাৎ সময়ের দেশে এসে যোগ হয় সময়াতীত দেশ— জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তার মধ্যে আসক্তি নিরাসক্তির যুগলতা, বিষাদ-সুন্দর দুঃখ-আনন্দের মিলন নিবিড় ভালোবাসা। শঙ্খ ঘোষের কবিতার চিত্রকল্পে প্রকাশ পেয়েছে মানুষ এবং পৃথিবীর প্রতি, বেঁচে থাকার প্রতি, প্রতিবেশ-পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত গভীর ভালোবাসা।

''তোমার মৃত চোখের পাতা ভেঙে উঠে আসছে বাষ্পগহ্বর আর তাকে ঢেকে দিতে
চাইছে কোনো অদৃশ্য হাত যখন চারপাশে ফাটলে ভরে গিয়েছে
টল্‌মল্‌ পাহাড়
দৃষ্টিহারা কোটরের প্রগাঢ় কোলে ঝর্ঝর গড়িয়ে নামছে অবিরাম কত নুড়িপাথর আর
আমরা হলুদ হতে থাকা শ্বেতকরোটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি স্থির—
যেন কুয়াশার ভিতর থেকে উঠে আসছে চাঁদ
অথচ শনাক্ত করা যায় না আজও এত অভিসম্পাতের ভিতরে ভিতরে বিষাক্ত লতাবীজের
ঘন পরম্পরা কে তোমার মুখে তুলে দিয়েছিল সেদিন, ঝিমধরা শীতরাত্রির
অবসরে।

আমি জীবনেরই কথা বলি যখন এই নীল অধোনীল নিশ্বাসের প্রতিচ্ছায়ায় ছড়িয়ে থাকা
পাতাগুলি কেঁপে উঠতে থাকে বাসুকীর শিরে আর মর্মের মর্মরে হা হা করে
ওঠে তরাইয়ের জঙ্গল
আমি জীবনেরই কথা বলি যখন জান্তব পদচ্ছাপ দেখতে দেখতে ঢুকে যাই দিগম্বর
অন্ধকারের ভিতরে ভিতরে কোনো আরক্তিম আত্মঘাতের ঝুঁকেথাকা কিনারায়
আমি জীবনেরই কথা বলি যখন তোমার মৃত চোখের পাতার ওপর থেকে অদৃশ্য
হাত সরিয়ে নিয়ে কোটরে কোটরে রেখে যাই আমার অধিকারহীন আপ্লুত
চুম্বন—

তোমার মৃত চোখের পাতা ভেঙে উঠে আসছে বাষ্পগহ্বর আর তাকে ঢেকে দিতে
চাইছে কোনো অদৃশ্য অশ্রুত হাত এই টল্‌মল্‌ পাহাড়।''[২০]

—চিত্রকল্পসমূহ মায়াময় অথচ মজ্জায়-মজ্জায় ক্ষোভ এবং ক্ষোভ পরবর্তী ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গ পরবর্তী

আত্মসমালোচনা, আত্মসমালোচনা-আত্মপরাভব পর আত্মজয়ে আস্থা— তীব্র ভালোবাসা আঙুলে আঙুলে জড়ানো, কাঁধে হাত রেখে দৃঢ়ভাবে হেঁটে যাওয়া-আসা।

> ‘‘এইভাবে এক-একজন কবির ভালোবাসার পরিধি আঁকা হয়ে যায় রচনার ভিতরে, জীবনের সঙ্গে জড়িত হবার আকুলতা কাজ করে যায় এইভাবে, অথবা ম্যাক্সমূলরের এই সূত্রও ঠিক যে অভাববোধের আকুতি থেকে জন্ম নেয় এসব সাদৃশ্যের সন্ধান অথবা প্রত্যক্ষের সঙ্গে লগ্নতা। কিন্তু এই লগ্নতা শেষ পর্যন্ত কতদূর লগ্ন? এই ভালোবাসা কতদূর আসক্ত? খুব বেশিদূর আসক্তি কবিকে নিয়ে যেতে পারে এমন ব্যক্তিগত বিন্দুতে যেখানে অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের জাল থেকে বেরোতে পারছেন না কবি, প্রতিমার বৃত্তে যেখানে তৈরি হচ্ছে একটা অনড় গড়ন, নিরেট গোপনতার মধ্যে। এবং আরো একটা বিপদ হয়তো এই যে কবি তাঁর পুরোনো প্রতিমাজগতের বারংবার আবর্তনে নিজেকে ঘিরে নিচ্ছেন এক সংকীর্ণ মণ্ডলে। তাই প্রতিমানির্মাণের খেলাতেও চাই আসক্তি-নিরাসক্তির যুগলতা, কবি যতটাই তাঁর বিষয়ের দিকে এগিয়ে যান, ততটা আবার ফিরেও আসেন তার থেকে।’’[২১]

তাঁর কবিতাসমূহের পরতে পরতে জীবনের চিত্রকল্প— তাতে কোথাও ক্ষোভ-ব্যঙ্গ-চাবুক আবার কোথাও তীব্র ভালোবাসা-প্রেম-মমতা-দোয়া-প্রার্থনা। তবে আসক্তি যত বেশি গভীর অনাসক্তিও ততটাই— এভাবেই বাঁধতে-বাঁধতে খুলে দিয়েছেন জীবনের লগ্নসমূহ, প্রতিবাদ এবং ভালোবাসা।

> ‘‘ঠিক, একই সেই বাড়ি
> কিন্তু ভিতরে ঢুকলে দমবন্ধ হয়ে আসছে।।
>
> এখানে ছিলাম একদিন, কিন্তু ঠিক এখানেই নয়
> জানালাগুলোকে এখন করে দেওয়া হয়েছে দেয়াল
> কাজ শেষ হয়নি এখনও।
> শুধু অনেকটা ওপরের ঘুলঘুলি থেকে এখনও কিছু আলো ছিকরে পড়ছে।
>
> ঢেনা ঘরগুলির ভিতরে ভিতরে ঘুরপাক খেতে খেতে ভাবি
> সবদিকে এত অবরোধ কেন?
>
> এ সময়ে আরো বেশি দ্রুত
> খুলে যাওয়ার কথা ছিল না কি? খুলে দেবার?
> সহজে চলার?
>
> নীচে পথে বসে বসে সেই বুড়োটি এখনও একমনে

সারাই করে চলেছে ছেঁড়া জুতো।''[২২]

আবার—

''ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়েছ ঘোর রাতে
দিশেহারা বলবে যে তেমনও কোথাও কেউ নেই
গা থেকে গড়িয়ে যাচ্ছে ভার
বয়ে যাচ্ছে পথে বা নালায়
হালকা শরীর নিয়ে এগিয়ে চলেছ তুমি কৃষ্ণকান্ত শেষে—

বৃষ্টি যতখানি পারে কে আর পেরেছে তত দিতে!''[২৩]

বেঁচে থাকার প্রহরগুলি আভাময়— ভালোবাসার নির্মল ধ্বনিতে, যদিও তার ভেতরে রয়েছে ক্লেদ, গ্লানি, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস-হত্যা-খুন-গুম আবার জলের ব্যথা, রাত্রির কলস, সাঁকো পেরোনোর গাঢ় জীবনকাল। বর্তমান অস্থির যুগসংকট মুহূর্তে কবির এই প্রাণময় বিশ্বাস যা প্রার্থনার মতো বর্তমান ধূসর সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে; আত্মার আপন অধিকারে সংগ্রাম অথবা বলা যেতে পারে তারুণ্য নিয়ে জীবিত থাকার প্রার্থনাই শঙ্খ ঘোষের কবিতার মূল সুর। সময়ের অন্ধকার থেকে জীবনের প্রাণময় আশ্বাস— যা রূপময় চিত্রকল্পে সজ্জিত। রূপময় চিত্রকল্পের আলোচনান্তে এবার তাঁর কবিতার বারান্দা অর্থাৎ ছন্দ নিম্নে আলোচিত।

''বিষ্ণু দে আমাদের মনে করিয়ে দেন আরাগঁ-র এই উক্তি যে কাব্যের ইতিহাস হলো তার টেকনিকের ইতিহাস। টেকনিকের সেই ইতিহাস লক্ষ করে বলা যায়, ছন্দে সমর্পিত শব্দেরই নাম কবিতা। অবশ্য এ সংজ্ঞা সহজ বলেই জটিল : কেননা ছন্দ কাকে বলে, শব্দই-বা কী, এবং সমর্পণ কেমনভাবে সম্ভব, এসব চিন্তা যতক্ষণ না কবি, পাঠক বা সমালোচকের ধারণায় পৌঁছবে, ততক্ষণ এই সূত্রটি দিয়ে কবিতার রহস্য কিছুমাত্র ধরা যায় না। কোলরিজের 'শ্রেষ্ঠ শব্দের শ্রেষ্ঠ ব্যূহ' অথবা মালার্মের 'শব্দই কবিতা' তত্ত্বকেও শিথিল অর্থে গণ্য করলে তুচ্ছ শোনায়। বস্তুত মনে হয় না যে অপৃথক্-যত্নজাত ছন্দ-শব্দের স্বতন্ত্র বিচার কোনোরকমেই সম্ভব। কবিতার জন্য নির্দিষ্ট কোনো শব্দ নেই, যে-কোনো শব্দই কবিতার শব্দ— একথা মেনে নেবার পরের মুহূর্তেই বলতে হয় যে তবু প্রাত্যহিকের শব্দে আর কবিতার শব্দে কতই ভিন্নতা! তবে কি ছন্দই এই ভিন্নতা এনে দেয়? হয়তো ছন্দই, কিন্তু কোন্ ছন্দ?''[২৪]

—'হয়ত ছন্দই, কিন্তু কোন্ ছন্দ?' কবিতার ছন্দ মূলত ধ্বনি ও যতির আবর্তন অর্থাৎ এই আবর্তনে কোথায় থামতে হবে, রুদ্ধদল (Closed Syllable) বা মুক্তদলের (Open Syllable) উচ্চারণে

কোথায় কত সময় দিতে হবে তার প্রত্যাশিত নিয়মবোধ। এই নিয়মবোধ দ্বারা কবিতা উচ্চারিত হলে কবিতার রহস্য, ভাব ও ধ্বনির সৌন্দর্য স্পষ্টতর হয়। কিন্তু আধুনিক কবিতার ছন্দের ইতিহাস 'গদ্যপদ্যের' বিরোধ মেটানোর ইতিহাস অর্থাৎ 'বিরোধ-মীমাংসার' ইতিহাস— সেই ছন্দ-ইতিহাসে শঙ্খ ঘোষের কবিতার ছন্দের অবস্থান কোথায়? শঙ্খ ঘোষের কবিতা কথার পর কথমালা নয়, নীরবতাও। আবার শব্দ থেকে পালিয়ে গিয়েও নয়, শব্দের সংযমে রচিত— নতুন-নতুন শব্দে নয়, শব্দের নতুন-নতুন অর্থে।

> ''নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই কবির অভিপ্রায়। মধুসূদনের মতো পরিশ্রমী শব্দচয়ন কবিতাকে একটা স্বতন্ত্র চেহারা দেয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার তারই মধ্যে লুকোনো থাকে পতনের বীজ। একরকম অভ্যাস তৈরি হতে পারে কবিতায়— ম্যানারিজম—যা হয়তো কবির স্বাতন্ত্র্যকে ঠিক ঠিক ধরিয়ে দেয়, কিন্তু কবিতার কাজ তো কেবলমাত্র কবির স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেওয়া নয়, প্রতিটি কবিতায় আরো একবার নিজেকে প্রতিফলিত করে তোলাই কবির পক্ষে প্রয়োজন। শব্দ রচনার অতিসাধ্য প্রেরণা শেষ পর্যন্ত কবিকে ঐ জড় অভ্যাসের মহাতমসায় ঠেলে নিতে পারে, এ আশঙ্কা থেকেই যায়।
>
> নতুন শব্দের সৃষ্টি তাহলে শেষ কথা নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই মূল। কিন্তু শব্দের নতুন সৃষ্টি কেমনভাবে সম্ভব? তখন আমাদের মনে পড়ে যে গ্রন্থকীটের ভাষা নয়, লৌকিক ভাষা মৌখিক ভাষাই হলো কবিতার অবলম্বন। কবিতার শব্দ নামে পৃথক কোনো বস্তু নেই, সমস্ত প্রচলিত শব্দই কবিতার শব্দ।''[২৫]

তাঁর কবিতা দুই শব্দের সংযোগবিন্দুর স্পন্দনের উপরে নির্মিত— প্রগাঢ় বেদনাবোধের সঙ্গে ব্যঙ্গ , বিদ্রোহ, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পর গাঢ়-উজ্জ্বল আলোর সন্ধানী। এই অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্বর— ধ্বনির জাদু মূলত মিশ্রকলাবৃত্তে সম্পূর্ণ, তবে অন্যান্য ছন্দেও কবির পারদর্শিতা কম নয়।

প্রকৃতপ্রস্তাবে শঙ্খ ঘোষ ছন্দে বাক্‌স্পন্দের মিলন এবং 'অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্বর' অর্থাৎ বোধ ও ব্যক্তিত্বের উপরে জোর দিয়েছেন, যার ফলস্বরূপ ছন্দের তথাকথিত নিয়মাবলী কিছুটা হলেও আলগা হয়ে গিয়ে প্রাধান্য পেয়েছে 'ব্যক্তিগত ছন্দ'।

> ''এইভাবে দেখলে মিলপ্রত্যাশী কবির মধ্যে সেই মনটিকে চিনে নিতে পারি, বিশৃঙ্খল বেঁচে থাকার মধ্যে যে-মন একটা সমগ্রতাকে তুলে আনতে চায়। কোন্ কবি তা না চান? এই মুহূর্তের তরুণ কবিও কি চাইবেন না তা? তার মানে এ নয় যে সেজন্যে আজ কবিকে ঘুরে যেতে হবে ছন্দমিলেরই দিকে। তার মানে কেবল এই যে তাঁর মনকে রাখতে হবে সংস্কারহীন। তাঁকে জানতে হবে যে 'মিলিয়ে কেন লেখো না' বড়োদের এই ভর্ৎসনা যেমন অন্তঃসারশূন্য, ততটাই কুসংস্কারময়

এই ধারণা যে মিল মাত্রেই পরিত্যাজ্য। যেমন ছন্দ থেকে অছন্দে সহজে যাওয়া-আসার পথ আজ খোলা রাখতে হয় কবিকে, একই কবিতায় ছন্দোহীন কথার চাল থেকে যেমন আলগা পায়ে চলে যাওয়া যায় ছন্দের দিকে, তেমনি আজ খুলে রাখা ভালো মিল-অমিলেও মধ্যপথ। কবিতা যে এটা চায় কোনো বাহারের জন্য নয়, সমগ্রের সঙ্গে দূরবর্তী এক লগ্নতারই জন্য।''[২৬]

মিল বা অমিলের দ্বন্দ্ব নয়, সংস্কারবিহীন মন নিয়ে তাঁর যাত্রা সমগ্রের দিকে— জীবনের সঙ্গে লগ্ন হওয়ার দিকে। সমস্ত রকমের না-কে আঁকতে আঁকতেও হ্যাঁ-এর দিকে তাঁর অবিরত চলা— ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও।

''এমন আকাশ হবে/ তোমার চোখের মতো/ভাষাহীন নির্বাক পাথর।।
দৃষ্টি তার স্থির হবে/মৃতের প্রাণের মতো/উদাসিন নির্মম শীতল।।
তুমি আছো সর্বময়/রাত্রির গহনে মিশে—/আমি এক
ক্লান্তির কফিনে।
তুমি যদি মৃত্যু আনো/অবসাদে মূক আর/
কঠিন কুটিল রাত্রি জুড়ে— ।।''[২৭]

প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''দিনগুলি রাতগুলি'' (১৯৫৬) কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা থেকেই ছন্দের পরীক্ষা এবং বোধ পরিলক্ষিত। কবিতাটি মূলত মিশ্রবৃত্তে রচিত হলেও দলবৃত্ত-কলাবৃত্তের মিশ্রিত চাল পরিলক্ষিত হয়—

''কবি রে তোর/শূন্য হাতে
আকাশ হবে/পূর্ণ—
উদাস পাগল/গভীর সুরে
ডাক দে তারে/ডাক দে!''[২৮]

৮+৮+১০ মাত্রাবিন্যাসে উপরের অংশটি বিন্যস্ত হলেও পরের অংশটি ৪+৪ এবং ৪+২ পর্যায়ক্রমে মাত্রাবিন্যাসে বিন্যস্ত। আবার এই কবিতাতেই দলবৃত্ত-কলাবৃত্ত মিশ্রিত চাল দেখা যায়।

অন্যদিকে—

''কেবল অম্বার কণ্ঠ/এখনো নদীর জলে/'সুমন, সুমন'
আর আমি বলে উঠি/এসো এসো উঠে এসো/উদ্দালক হও
স্পষ্ট হও, বাঁচো—
শুধু মুর্খ অভিমানে/বসে থেকে জলস্রোতে/কখন যে আরুণি সুমন
তৃষ্ণদেবতার মূলে/একাকার হয়ে যায় তা/আমার বোধেও ছিল না''[২৯]

— প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি ৮+৮+৬+ এবং শেষ দুটি পঙক্তি ৮+৮+১০ মাত্রাবিন্যাসে গঠিত। এছাড়াও মাঝে রয়েছে ৬ মাত্রার একটি সংযোজক পর্ব। চিরাচরিত মাত্রা পরিমাপ। ব্যতিক্রম নয়, বাক্যের শব্দ, ধ্বনি, ব্যাকরণ সমন্বয়ে পরিপূর্ণ কাব্যঝংকার। ছন্দের ভেতরে থেকেই কীভাবে বলিষ্ঠ, ব্যতিক্রমী উচ্চারণ করা যায় শঙ্খ ঘোষের কবিতা তার বিশ্বস্ত প্রমাণ। শঙ্খ ঘোষ বাংলা ছন্দের রূপ ও বৈচিত্র্য, নিয়ম ও প্রবহমানতা নিয়ে অনেক ভেবেছেন এবং তাঁর ভাবনায় ধরা পড়েছে, কবির ছন্দ জানা আর ছান্দসিকের ছন্দ এক নয়— 'কবিকে কি ছন্দ জানতে হবে যেমনভাবে জানেন মেনস্‌বেরি বা প্রবোধচন্দ্র সেন?'

> ''কবির ছন্দ-জানা তাহলে অনেকটাই শ্রুতিনির্ভর, কোনো কোনো সময়ে হয়তো অশিক্ষিতপটুত্ব। এখানেই বিপদসম্ভাবনার সূত্রপাত। যদি দেখা যায় এই পটুতা তাঁকে স্থিরনির্দিষ্ট ছন্দকাঠামোর অন্তর্বর্তী করে রাখছে, তাহলে কবি আর পাঠকের বোধে বিরোধ ঘটে না বড়ো, কিন্তু কবি যদি মনে করেন তিনি এর বাইরে আরো কোনো ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, কাঠামোর বাইরে দাঁড়িয়ে? যদি তাঁর মনে হয় যে প্রচলিত নিরূপিত ছকটিকে ভেঙে দেবার দরকার হচ্ছে কিছু? পাঠক তাঁকে দেবেন না সেই স্বধীনতা? ছন্দের বিশৃঙ্খলা নয়, কিন্তু ছন্দের প্রসারণ কি চাইবেন না কবি? পাঠকের রায় চিরাচরিতের পক্ষে, অভ্যাসরে অনুকূলে, কেননা তা নইলে তাঁর কান সহজে খুশি হয় না। তখন হয়তো ঈষৎ-বিরক্ত ঈষৎ-অভিমানী ভাবে আপনারা বলবেন, লরেন্সের ধরণে, 'Well I don't write for yours ears'!
>
> আধুনিক কবির পক্ষে একথা ভুলে থাকা সম্ভব নয় যে ছন্দের সমস্যা আসলে ব্যক্তিত্বেরই সমস্যা, সে তো কেবল ছান্দসিকের শুকনো পুঁথি নয়। ব্যক্তিরই মুক্তির জন্য ছন্দের ক্রম-উন্মোচনের প্রয়োজন ঘটে, দরকার করে তার অনড় চলৎশক্তি-হীনতার বাইরে বেরিয়ে আসা। কবি তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আমিটিকে 'কারো জন্য কোনো মার্জিন না রেখে' (যেমন একটি চিঠিতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ) ছড়িয়ে দিতে চান, তাঁর ব্যক্তিগত স্পন্দনকে সঞ্চারিত করতে চান ছন্দশরীরে। এই সঞ্চারের জন্যই কখনো কখনো মুক্তি খোঁজেন কবি।''[৩০]

'ছান্দসিকের শুকনো পুঁথি নয়'— নয় বলেই কবি তাঁর নিজের কবিতা-ক্ষেত্রে নিয়মের শৃঙ্খল ভেঙেছেন সচেতনভাবেই। তবে এই ভাঙন কী 'অবহেলায়' ভাঙন?

> ''কিন্তু মুক্তি মানে তো যা-খুশির অবহেলা নয়। যার ব্যক্তিত্বই প্রস্তুত নয় সে কেমন করে জানবে কাকে বলে মুক্তি? কীই-বা মুক্তিপণ? ছন্দকেও গড়ে তুলতে পারলে তবেই তাকে ভাঙা যায়, গড়তে যিনি জানেন না ভাঙবার কোনো অধিকারও তাঁর নেই। তখন কবিকে মনে রাখতে হয় যে বাইরে ছড়ানো উপাদান উপকরণের

সঙ্গে প্রতিনিয়ত তাঁর যুদ্ধ, এক-একটি কবিতা লেখা অনেক বিরূপতার মধ্য দিয়ে এক-একটি যুদ্ধের সমাপন।''[৩১]

—'অনেক বিরূপতার মধ্য এক-একটি যুদ্ধের সমাপন'— ছন্দ ঠিক রেখেও কীভাবে জীবনের সৎস্পন্দন-কম্পনকে ধরা যায় তার সফল শিল্পী শঙ্খ ঘোষ। যথা—

''বালির ভিতরে ওরা/ঢুকে যায় পলকে পলকে
মুছে যাওয়া দাগ নিয়ে/কতমতো কথা বলে লোকে
কত জল ভরে রাখে/ওইটুকু লাল ডানা, আর
কত স্থির হয়ে থাকে/সমস্ত দিনের অস্থিরতা।''[৩২]

আবার—

''বসতি ফুরিয়ে গেছে/ঘন হয়ে রয়েছি কজন
আমাদের ঘিরে আছে/ঘনতর দেড়শো মন্দির
কোনো সমাগম নেই,/সবুজ হয়েছে মরা জল
আগল খোলার শব্দে/শিবলিঙ্গে বাদুরের ছায়া।''[৩৩]

—দ্বিতীয় কবিতাটি ৮—১০ মাত্রার পর্ব সজ্জায় মহাপয়ার ছন্দে রচিত। সাধারণত চরণান্তরে ভাব প্রবাহিত না হয়ে প্রতি চরণে ভাব সমে সে কার্বিক সৌন্দর্য স্পষ্টতর হয়েছে।

''পাহাড়ে বালির চরে/একাকার হয়ে যাওয়া/ পাথরে বালিতে
কাকে নির্বাচন দেবে/ সেকথা বোঝার আর/সামর্থ্য ছিল না
তাই সে কপিস এই /ব্যর্থতার চেয়ে আরো/ব্যর্থতায় ভাঙা
আত্ম-ইতিহাস থেকে/গড়ে তোলে শাপগ্রস্ত/দিনের জড়োয়া।''[৩৪]

৮+৮+৬ মাত্রার তিন পর্ব অথবা রয়েছে ৮+৮+১০ মাত্রার তিন পর্ব— কবির স্বাধীন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাতে ধরা আছে কথ্যচাল আর বাক্‌স্পন্দ। এক্ষেত্রে তিনি স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর কথাতেই—

''শব্দকে ধরে রাখে তার ছন্দ বা স্পন্দন অথবা একই সঙ্গে বলা যাক ছন্দস্পন্দ। ছন্দ কি দেখা যায়? অদৃশ্য কিন্তু ''শ্রুতিগোচর এই ছন্দের প্রবাহের মধ্যে ভেসে আসে শব্দগুলি, ফলে ছন্দের নকশা অত্যন্ত সুনিয়মিত হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন অন্ধভাবে একে অন্যের গায়ে এসে লেগে যায়, অনিবার্যভাবে এসে যায়, তার দ্বারা নিপুণ সুগঠিত একটি পদ্যপঙ্‌ক্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সজীব ব্যক্তিত্বের কোনো লক্ষণ তার মধ্যে প্রায়ই তখন পাওয়া যায় না। তাই এ-ও দেখা যায় যে শব্দ-চেতনাগত আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ইতিহাসে দেখা দেয় এক ছান্দসিক বিদ্রোহ, ছন্দোমুক্তির সাধনা। বস্তুত ছন্দের আলোড়ন শব্দের আলোড়ন একই সূত্রে বাঁধা।''[৩৫]

—শিল্পীর সজীব ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত ছন্দ শঙ্খ ঘোষের অনুসন্ধান, তাই তাঁর কাব্যের ছন্দে তারই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অনুরণিত হয়েছে।

> ''যেমন ভাষায় তেমনি ছন্দে এবং চিত্রকল্প বা ইমেজে পাই আমরা একই অতিক্রমণ। ছন্দের একটা আঙ্কিক কাঠামো তো থাকেই। সেই কাঠামোর মধ্যে বাক্‌স্পন্দকে ধরার কথা বলেন শঙ্খ ঘোষ। কারণ বাক্‌স্পন্দের মধ্যেই ধরা পড়ে প্রতিদিনের, সমসময়ের তরঙ্গ। বর্তমান সময়ের নির্যাসকে ধরতে হবে কবিতায়, তাই কবিতার ভাষা উঠে আসবে প্রাত্যহিক পৃথিবী থেকে, সাংসারিক জীবনযাপন থেকে। আর সেই কারণেই তার মধ্যে নিহিত থাকা চাই প্রতিদিনের বাক্‌স্পন্দের দোলা। কিন্তু বর্তমানের যেমন উত্তরণ ঘটে চিরন্তরের দিকে, ভাষায় যেমন নীরবতায়-গানে এসে যায় অসীমতার ছোঁয়া, বাক্‌স্পন্দেও তেমনি সঞ্চারিত হবে কবির ব্যক্তিগত ছন্দ। ব্যক্তিগত ছন্দই বাক্‌স্পন্দকে নিয়ে যায় সীমাবদ্ধ কালের বাইরে। ব্যক্তিগত ছন্দের প্রবর্তনাতেই থাকে মুক্তির পথ। তাই ছন্দশরীরে বাক্‌স্পন্দকে আত্মীকরণই যথেষ্ট নয়, তার মধ্যে ধরতে হবে কবির ব্যক্তিগত স্বরের স্পন্দনকে।''[৩৬]

কলাবৃত্ত ছন্দে শঙ্খ ঘোষের সাফল্য কম নয়, পাঁচ, ছয় সাত মাত্রার পর্বে অত্যন্ত দৃঢ়। যথা—

সাতমাত্রার কলাবৃত্ত—

> ''কোনো-যে মানে নেই /এটাই মানে।
> বন্য শূকরী কি/নিজেকে জানে?
> বাঁচার চেয়ে বেশি/বাঁচে না প্রাণে।''[৩৭]

ছয়মাত্রার কলাবৃত্ত—

> ''ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
> 'সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
> 'চোখ নেই? চোখে দেখতে পান না?
> সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান—'
>
> আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
> ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে!
> আমি কি ত্যি আমারও সমান
> সদরে, বাজরে, আড়ালে?''[৩৮]

আবার—

> ''দুপুরে-রুক্ষ/গাছের পাতার

কোমলগুলি/হারালে
তোমাকে বকব,/ভীষণ বকব
আড়ালে।''[৩৯]

পাঁচমাত্রার কলাবৃত্ত—

''ইচ্ছে হলো ব্যাকুল, তবু খুলল না সে ঘর
অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠল স্বর
'এ যে বিষম! এ যে কঠিন!
কী যে ছোট বাড়ি—
সকালও তার মুখ দেখে না, বিকেলে করে আড়ি'[৪০]

আবার—

''আমি কেবল দেখেছি চোখ চেয়ে
হারিয়ে গেল স্বপ্নে দিশা হারা
শ্রাবনময় আকাশভাঙা চোখ।''[৪১]

শঙ্খ ঘোষ কবিতায় বাক্‌স্পন্দকে ধারণ করার অধিকারী— কলাবৃত্ত ছন্দে যে সেই 'স্পন্দ' ধরা যায় স্বচ্ছন্দে এবং সাবলীলভাবে তা তাঁর কবিতায় প্রমাণিত।

''শঙ্খ ঘোষও এরকম কথাই বলেছেন তা আমরা আগে দেখেছি। কিন্তু যেহেতু তাঁর মতে এই বাক্‌স্পন্দকে জয় করবার সাধনাই আধুনিক কবিদের ছন্দ-সাধনার অভিমুখীনতা— যে ছন্দে বাক্‌স্পন্দ আগে বিশেষ প্রধান হয়ে ওঠেনি— সেখানেই তাকে ধ্বনিত করতে হবে— এমন একটি ইচ্ছা কবিদের থাকাই স্বাভাবিক। শঙ্খ ঘোষের সেই ইচ্ছা ছিল তা তাঁর কবিতায় প্রমাণিত। কলাবৃত্তের ছন্দের আধারে রচিত কবিতায় বাক্‌স্পন্দের এত ব্যাপক পরীক্ষা বোধহয় আর কোনো কবি করেননি।''[৪২]

তাঁর বলার ধরণ স্পষ্ট হয় এবং কতটা সজীব ব্যক্তিত্বের স্বরে উচ্চারিত তার নিপুণতা আঁচ করা যায়। অস্বাভাবিক নয়, কেননা কবি শব্দের শক্তিতে বিশ্বাসী এবং এও জানেন শব্দের শক্তি কীভাবে সঞ্চারিত হয় নতুন-নতুন অর্থে। তাঁর কথায়—

''কবিতাও খোঁজে সেই অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্বর। প্রথমটি ধরা পড়ে কণ্ঠস্বরের ভিন্নতায়, পরেরটি তেমনি দেখা দেয় ছন্দস্বরের স্বাতন্ত্র্যে। অন্য ভাষায় হয়তো বলা যায় যে এই কণ্ঠস্বরের, ব্যক্তিগত ধ্বনির এই জাদুটিই সঞ্চারিত করে দেওয়া চাই কবিতার ছন্দের মাঝখানে। তাহলে সেখানে, একমাত্র সেখানেই, কোনো ম্যানারিজমের বাহন না হয়েও কবিতার দেহ হয়ে উঠতে পারে স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব। যে শব্দশৃঙ্খলা রচিত হয়ে আছে কাব্যপঙ্‌ক্তিতে, তার মধ্যেকার সংযোগসূত্রগুলিকে

ছিঁড়ে আলগা করে দিতে হবে বলেছিলাম। কে দেবে? কবির কণ্ঠ! প্রতি দুই শব্দের মধ্যে কবির মুখই ভেসে ভেসে সরে যায়, তখন কোনো শব্দকেই মনে হয় না মৃত, নিছক পুরোনোও মুহূর্তমধ্যে মায়াময় নবীন হয়ে ওঠে, কোনোরকমের উগ্র লক্ষণ না নিয়েও জীবনানন্দের ভাষার মতো শব্দ তখন খুঁজে পায় একান্ত স্বকীয়তার ধ্বনি, যে-কোনো ফ্যানি তখন বুঝতে পারেন কীটসের এই সমস্ত চিৎকারে কত সত্য মূল্য আর্ত হয়ে আছে : See here it is— I hold it toward, you!

সব কবিরই বুকের মধ্য থেকে ছুঁড়ে দেওয়া এই হাত, সেই হলো তাঁর পবিত্রতম শব্দ।''[৪৩]

লোক কবির ছড়ার ছন্দকে 'ভাবগম্ভীর কবিতাতেও ব্যবহার করে কৌলীণ্য দিলেন রবীন্দ্রনাথ'। এই ছন্দ অর্থাৎ দলবৃত্ত ছন্দ তারপর থেকেই 'কবিতার ভাষায় কথা সংলাপী আমেজ ফোটাতে', আধুনিক জীবনের নানা অনুভূতিকে সজীব রূপ দিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে। শঙ্খ ঘোষের কবিতাতে দলবৃত্ত ছন্দ অনন্য মাত্রা পেয়েছে। যথা—

''নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে!
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী
দু-এর মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি'।''[৪৪]

জীবন এবং জীবনের তীব্রতা— বাঁচার আনন্দ, 'খাঁচাতে বন্দী', 'ভাত' কী সমুজ্জ্বলভাবে উচ্চারিত হয়েছে! বাক্ এবং বাক্স্পন্দ ধরা পড়েছে পরতে পরতে। স্মরণীয় তাঁর 'বুড়িরা জটলা করে', 'পোকা, 'রাস্তা', 'চাবুক', 'পিঁপড়ে', 'ইঁদুর', 'কলকাতা', 'চালচলন', 'বাবুমশাই', 'ভিখিরি ছেলের অভিমান', কালযমুনা', 'মার্চিং সঙ্', 'অন্যরাত', 'চাপ সৃষ্টি করুন' কবিতাসমূহ।

''তেজস্বিতার ভঙ্গিটি দলবৃত্ত ছন্দে সহজেই ফোটে কিন্তু ভাব-গভীরতার ভিন্নতর তলেও শঙ্খ ঘোষ সহজেই নিয়ে যেতে পারেন আমাদের— এই ছন্দেই। চলমান জীবনের মূল বহমানতাকে স্পর্শ করেন যে গৃহত্যাগী— মূর্তি-মন্দিরের চাপে হাঁপিয়ে ওঠা তাঁর অন্তরাত্মাও প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই ছন্দে—

গলির ভিতর গলির ভিতর গলির ভিতর গলি
খোঁজে নিজের স্বর—

একটি কথা বলব, কিন্তু কোন্ গলাতে বলি
বিশ্বনাথের কেন্দ্রে আছে বিন্দু অনীশ্বর।''[৪৫]

শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় স্থিতিস্থাপক মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত— তিন রকমের ছন্দতেই সফল পরীক্ষক। মিশ্রবৃত্তে আবেগ, দর্শন, প্রশ্ন-সমস্যা-সংকট-বিতর্ক, যুক্তির জাল-নাটকীয়তা-প্রবহমান বিবৃতি অথবা আত্মকথন; কলাবৃত্তে প্রতিদিনের যাপন-অপমান-ভালোবাসা, দলবৃত্তে আঘাত-ঘাত সাবলীলভাবে নির্মাণ-সৃষ্টি করেছেন। ছন্দের বন্ধন নয়, ছন্দের শৃঙ্খলকে অবলীলাক্রমে ধারণ করেছেন অলংকার হিসেবে। অনায়াসে মিলিয়েছেন ভাষার কথ্যচাল এবং বাক্‌স্পন্দকে—

> ''আধুনিক কবিতার পরিচয় বাক্‌ছন্দে। প্রাত্যহিক বাচনের শব্দভঙ্গি, স্বরভঙ্গি আর শ্বাসক্ষেপভঙ্গি যে-ছন্দে একত্রে বেঁধে নেওয়া যায়, সেই ত্রিবেণীর প্রতি আধুনিক কবিতার দৃষ্টি, যাকে ভুল করে কেউ গদ্যছন্দ ভাবেন। গদ্যছন্দ বা মুক্তছন্দ ওই সিদ্ধির পথে অন্যতম উপায়, কিন্তু এর কোনোটাই একমাত্র পন্থা নয় এবং ইমেজিস্ট সদস্যরাও জানিয়েছিলেন যে তাঁরা মুক্তছন্দকেই কাব্যরচনায় একতম প্রকরণ বলে দাবি করেন না।''[৪৬]

গদ্য ছন্দতেও তিনি বিচরণ করতে পারেন অনায়াসে—

> ''এই পৃথিবী না থাকলে থাকত শুধু অন্ধকার। কিছুই থাকত না এই সৌরলোক না থাকলে। কিন্তু কোথায় থাকত সেই না-থাকা, কোন্ পাত্রে? অন্তহীন এই নাস্তি যখন হা হা করে এগিয়ে আসে চোখের উপর, দুলে ওঠে রক্ত— তখন তুমি কথা বলো মহাশূন্যে অন্ধকারের ফুটে ওঠার মতন, সেই তোমার ভাষা হোক প্রথম আবির্ভাবের মতো শুচি, কুমারী— শষ্পের মতো গহন, গম্ভীর
>
> এই তো, এই তো রাত্রি হলো। বলো, এখন তুমি কথা বলো।''[৪৭]

অথবা—

> ''আজ আর কোনো সময় নেই সমস্ত কথাই লিখে রাখতে হবে এই সমস্ত কথাই যে নিঃশব্দ সৈকতে রাত তিনটের বালির ঝড় চাঁদের দিকে উড়তে উড়তে হাহাকারের রুপোলি পরতে পরতে খুলে যেতে দেয় সব অবৈধতা আর সব হাড়পাঁজরের শাদাধুলো অবাধে ঘুরতে থাকে নক্ষত্রে শুধু একবার একবারই ছুঁতে চায় ব'লে।
>
> ...
>
> আজ আর সময় নেই সমস্ত কথাই আজ লিখে রাখতে হবে এই সমস্ত কথাই এই সমস্ত কথাই''[৪৮]

—কবিত্বপূর্ণ গদ্য নয়, গদ্যকবিতা রচনাতে কবি সফল। বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা, বোধ আর প্রেরণা সমবেতভাবে সংহত হয়েছে চেতনার এক কল্প বিন্দুতে, ভাষার মধ্যে তৈরি করেছে এক বিভাময় শিল্প— যা অনন্য এবং স্বতন্ত্র্য।

> ''অনেকসময়েই আমার মনে হয়েছে যে ছন্দ-ভাবনায় ভুলভাবে দুই প্রান্তের সৃষ্টি হয়েছে কবিসমাজে। অনেক মনে করেন যে ছন্দে বা মিলে কবিতা লেখা মানেই আধুনিকতার পরিপন্থি হয়ে ওঠা, কুমুদরঞ্জনদের পৃথিবীতে পিছিয়ে যাওয়া। আবার অন্যেরা ভাবেন যে ছন্দের মিলের কারুকাজ ছাড়া কবিতা হতেই পারে না কখনো। 'এ দুয়ের মাঝে তবু কোনো কবি, তাঁর খুশিমতো, আবার নিতে পারেন এক তৃতীয় পথও। এই তৃতীয় পথটায় আমার কৌতূহল আছে। ছন্দোহীন ভাবে শুরু হয়ে কবিতা সহসা, অগোচরে প্রায়, এগিয়ে যেতে পারে ছন্দেরই দিকে, যেমন, ছন্দ দিয়ে শুরু করেও তিনি পৌঁছে যেতে পারেন ছন্দোহীনতায়, নিছক স্পন্দে। এই যাওয়া-আসাতে যদি কোথাও কোনো অসংবৃত ধাক্কা না লাগে, তাহলে সেটাই হতে পারে আমাদের আজকের দিনের অনায়াস ছন্দ, বাক্‌স্পন্দের সবচেয়ে কাছাকাছি, আমাদের প্রতিদিনকে ধরবার যোগ্য কাব্যকৌশল।''[৪৯]

শঙ্খ ঘোষের আস্থা কবিতার 'সত্যি'তে, 'অবাধ প্রগল্‌ভতার কোনো প্রশ্রয় নেই'। তাঁর কবিতা 'সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়'— 'শব্দের ভার, ছবি জৌলুস, ছন্দের দোল' নয়, 'দৈনন্দিন কথাবার্তার চাল, তার শ্বাসপ্রশ্বাস' ধরে রাখে। তবে 'জবরদস্তি' ব্যাপার নেই। তাঁর চিত্রকল্পসমূহ বোধ-মনন-শিক্ষণ-বাঁচন, সমাজ-দেশ-কাল-চেতনার গভীরতম বিন্দু থেকে উঠে আসে আর ছন্দ উঠে এসেছে জীবনের অভিঘাত থেকে— শব্দে শব্দের সংযোগবিন্দু থেকে, বিমিশ্রিতভাবে প্রতিদিনের কথা-নীরবতা থেকে। তবে তাঁর দৃষ্টি তৃতীয় পথে— বাক্‌স্পন্দে, প্রতিদিনের বেঁচে থাকার নিকটবর্তী।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৬৫

২. বসু, অম্বুজ : একটি নক্ষত্র আসে, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কল-৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৭২, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ আশ্বিন ১৪১১, পৃ. ১৪০।

৩. তদেব : পৃ. ১৩৯।

৪. Lewis, C. Day : The Poetic Image, Jonathan Cape, Thirty Bedford Square, London, First Published by 1947, Tenth Impression 1961, P. 18.

৫. দাশগুপ্ত, ধীমান : সিনেমায় ইমেজ, বাণীশিল্প, ১৪ এ টেমার লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ২৬।

৬. বসু, অমলেন্দু : সাহিত্য চিন্তা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কল-০৬, প্রথম প্রকাশ ২২ শ্রাবণ ১৩৭৯, পৃ. ৬৯।

৭. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৭৯।

৮. তদেব : পৃ. ৮৫।

৯. তদেব : পৃ. ৮৩।

১০. ঘোষদস্তিদার, গৌতম (সম্পা): বিষয় শঙ্খ ঘোষ, রক্তমাংস, এ-৫৮, রিজেন্ট পার্ক, রহড়া, কল-১১৮, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৮১, ৮২।

১১. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ২১১, ২১২।

১২. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.): নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ ২ই, নবীন কুণ্ডু লেন কল-০৯, প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ১০৬।

১৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১৬০।

১৪. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৬, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৪০৭।

১৫. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৩৮।

১৬. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ

বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৮০।

১৭. তদেব : পৃ. ১২৭, ১২৮।

১৮. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২১, পৃ. ২১১।

১৯. সিকদার, অশ্রুকুমার : কবির কথা কবিতার কথা, অরুণা প্রকাশনী, কল-০৬, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০০, দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৪১০, পৃ. ১২৫।

২০. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, প. ১২৮।

২১. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৬৬।

২২. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২১, পৃ. ৩৬৬।

২৩. তদেব : পৃ. ২৩৪।

২৪. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৩৫।

২৫. তদেব : পৃ. ৩০।

২৬. তদেব : পৃ. ১৬২।

২৭. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১৯।

২৮. তদেব : পৃ. ২১।

২৯. তদেব : পৃ. ১২৩, ১২৪।

৩০. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৬, ৪৭।

৩১. তদেব : পৃ. ৪৭।

৩২. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৫৭।

৩৩. তদেব : পৃ. ২২।

৩৪. তদেব : পৃ. ১৯।

৩৫. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৬।

৩৬. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.): নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ ২ই, নবীন কুণ্ডু লেন কল-০৯, প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ১০৫।

৩৭. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১৯৯।

৩৮. তদেব : পৃ. ৩১।

৩৯. তদেব : পৃ. ৫৬।

৪০. তদেব : পৃ. ৪৯।

৪১. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৪৯।

৪২. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৫৩।

৪৩. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৭, ৩৮।

৪৪. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৪৭।

৪৫. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৫৫।

৪৬. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৪০।

৪৭. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৮৯।

৪৮. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১২৯।

৪৯. ঘোষ, শঙ্খ : কথার পিঠে কথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩,প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৬৯।